প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো

কাঠামো কী:

আজ খুশি আপা ক্লাসে অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর ছবি নিয়ে এসেছেন। এই যে ছবিগুলো:

এখন তো আমরা বড় হয়েছি। খুশি আপা আমাদের শুধু বললেন 'চল দলে বসে...।' কথা শেষ হওয়ার আগেই আমরা সবাই দলে ভাগ হয়ে একেক দল কয়েকটি করে ছবি নিয়ে বসে গেলাম। নিচের প্রশ্নগুলো নিয়ে আমরা অনেক চিন্তা করলাম আর উত্তরগুলো লিখলাম:

ক্রম	প্রশ্ন	উত্তর
১	ঘর-বাড়ি/দালান-কোঠাগুলোর আকার/আকৃতি দেখতে কেমন? কোনো নাম আছে কি?	
২	কী দিয়ে তৈরি করা হয়?	
৩	কী কাজে ব্যবহার করা হয়?	
৪	আবহাওয়া/ পরিবেশের সঙ্গে এগুলোর গঠনের কোনো সম্পর্ক আছে কী? থাকলে কী ধরনের সম্পর্ক রয়েছে?	
৫	কী কাজে ব্যবহার করা হয় সে অনুযায়ী ঘর-বাড়ি/দালান-কোঠাগুলোর গঠনে পার্থক্য রয়েছে কি? থাকলে কী ধরনের পার্থক্য রয়েছে?	

প্রতি দল উত্তরগুলো শ্রেণিকক্ষে সবার সামনে উপস্থাপন করল। সবাই সবার উপস্থাপনা দেখার পর নীলা আর ফাতেমা বলল—

নীলা: দেখেছো, প্রতিটা ঘরবাড়ি, দালানকোঠা, স্থপনা, ইত্যাদি সব কিছুরই একটা নির্দিষ্ট গঠন আছে। একে আমরা বলতে পারি কাঠামো (structure)।

ফাতেমা: আরেকটা ব্যাপার দেখেছ? এই কাঠামো কেমন হবে তা অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে। যেমন— সেটি কি কাজে ব্যবহার করা হয়? কে বা কারা সেটি ব্যবহার করে? সেটি কোন এলাকায় অবস্থিত? এটি কোন সময়কালের? ইত্যাদি বিষয়ের উপর।

তমাল: আবার সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কাঠামো পরিবর্তিতও হয়-তাই না?

ওরা সবাই একমত হল।

আনাই: আচ্ছা, ঘরবাড়ি, উপাসনালয় ইত্যাদি কাঠামো তো মানুষের তৈরি, এ ছাড়া আশপাশে অন্য কাঠামো আছে না?

ঘণ্টা বেজে গেল, শেষ ক্লাস। খুশি আপা বললেন, বিভিন্ন ধরনের কাঠামো নিয়ে আমরা আরেক দিন আলোচনা করব।

বিভিন্ন ভৌগোলিক অবস্থান এবং তাদের বৈশিষ্ট (পর্বতমালা, মরুভূমি, মালভূমি, মেরু অঞ্চল, তৃণভূমি)

নীলা আজ মাঠে খেলার সময় হোঁচট খেয়ে পায়ে ব্যথা পেয়েছে। তাকে সবাই ক্লাসে এনে বসালো। টিফিনের পরে খুশি আপা ক্লাসে এলে ফ্রান্সিস বললো, আপা নীলা আজ পায়ে ব্যথা পেয়েছে। খুশি আপা বললেন তাই! কিন্তু কিভাবে? নীলু বললো, আপা আমাদের মাঠের একপাশে যে একটা উঁচু ঢিবির মত আছে সেখানে দৌঁড়াতে গিয়ে ব্যথা পেয়েছি। খুশি আপা বললেন, আহারে! খেলার সময় অবশ্যই আমরা সাবধানে খেলবো যেন ব্যথা না পাই। লক্ষ্য করলে দেখবে যে আমাদের খেলার মাঠের সব জায়গা কিন্তু সমান নয়, তাই না? গণেশ বললো, হ্যা আপা আমাদের মাঠের দক্ষিণ দিকটায় কিছু কিছু জায়গা একটু উঁচু।খুশি আপা বললেন, ঠিক বলেছ; সেরকম আমাদের চারপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশও কিন্তু এক রকম নয়—তাই না? সাকিব বললো, হ্যাঁ আপা, আমার বাড়ির পাশে একটা নদী আছে। এ পর্যায়ে খুশি আপা বললেন চলো তাহলে আমরা কিছু ছবি দেখি।

প্রশ্ন

- এসব ভৌগোলিক অবস্থানের নাম জানো কি?
- এদের মধ্যে কি কোন মিল/ অমিল খুঁজে পাচ্ছ?
- কী কী মিল/অমিল দেখতে পাচ্ছ?
- এ ছাড়াও আর কোনো রকম ভূমিরূপের নাম জানো?

তখন খুশি আপা বললেন আচ্ছা কেমন হবে বলতো যদি আমরা প্রত্যেকে একটি করে এরকম জানা অজানা ভূমিরূপের অভিধান বানাই?

তখন আয়েশা বললো আপা আমরা যে যে ভূমিরূপ সম্পর্কে বেশি কিছু জানিনা সেগুলো যদি ছবি এঁকে নিয়ে গিয়ে কোনো বই/ ইন্টারনেট/ বা বড়দের সাহায্য নিয়ে অভিধান বানাই তবে কেমন হয়?

খুশি আপা বললেন নিশ্চয় তোমরা তা করতে পারো। একাজে তোমরা ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান-অনুসন্ধানী পাঠ বইসহ ইন্টারনেট, অন্যান্য বই এমনকি অন্য শ্রেণির পাঠ্য বইয়েরও সাহায্য নিতে পারো।

রাতুল বললো, আপা আমরা ভবিষ্যতেও যদি এমন কোনো অজানা ভূমিরূপ সম্পর্কে জানতে পারি সেটাও তো এখানে যুক্ত করতে পারি, তাই না?

খুশি আপা বললেন, নিশ্চয়।

চলো আমরা ওদের মতো করে প্রশ্ন গুলোর উত্তর খুঁজে বের করে একটি অভিধান বানাই

তুহিনের করা ভূমিরূপ অভিধান

পাহাড়

৩০০ মিটারের অধিক কিন্তু ১০০০ মিটারের কম উচ্চতা বিশিষ্ট ভূমিগুলোকে পাহাড় বলা হয়।

নদী

মিষ্টি জলের একটি প্রাকৃতিক জলধারা যা সাগর, মহাসাগর হ্রদ বা অন্য কোনো নদী বা জলাশয়ে পতিত হয়।

তমাল বললো, আমাদের দেশেও তো এরকম অনেক ধরণের ভুমিরূপ আছে। আমরা তো সেগুলো খুঁজে বের করতে পারি।

খুশি আপা বললেন, ঠিক বলেছ রবিন, চলো আমরা বাংলাদেশের একটা মানচিত্র দেখি।

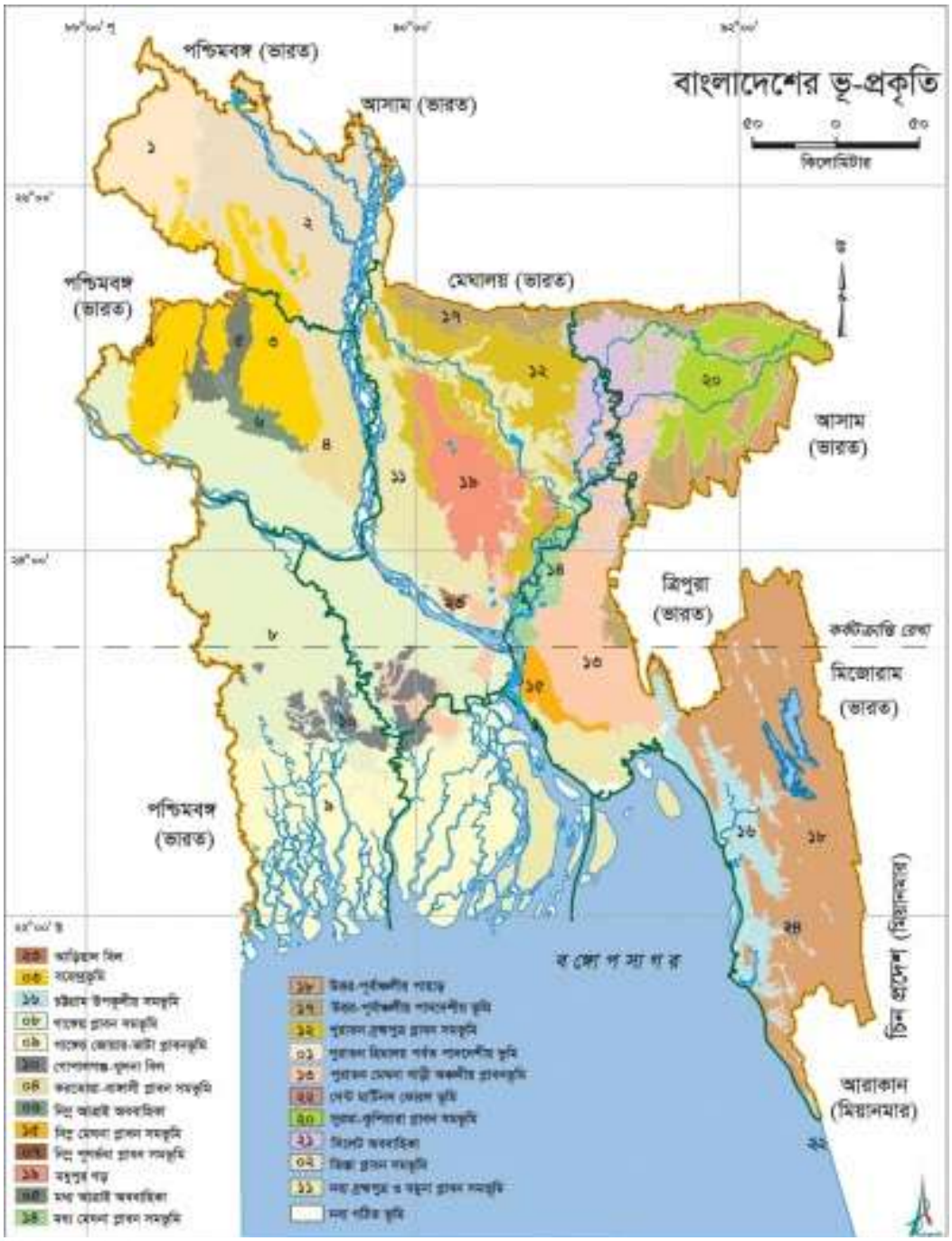

খুশি আপা বললেন,দেখো তোমরা যে যেখানে থাক, যে এলাকায় চলাচল কর তার মধ্যেও বৈচিত্র্যের শেষ নেই। আনুচিং বললো ও থাকে পাহাড়ী এলাকায়, নাজিফদের বাড়ি নদীর পাড়ে। শওকত বললো ও গিয়েছিল মামার বাড়ি সুনামগঞ্জে, সেখানে ও দেখেছে মস্ত বড় হাওড়। বর্ষাকালে সেটা হয়ে উঠেছিল সমুদ্রের মত, তাতে ঢেউও ছিল। ওরা নৌকায় বেড়িয়েছে।কিন্তু সে ওখানে একবার গিয়েছিল শীতকালে, তখন সবটা জুড়ে সবুজ ধানের ক্ষেত। সুবোধ বললো ও বন দেখে এসেছে - ওরা কয়েক পরিবার মিলে সুন্দরবন বেড়াতে গিয়েছিল রুপা বললো ওর দাদার বাড়ি কক্সবাজার যাওয়ার সময় ওরা ডুলাহাজরা বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্ক দেখেছ - সেটি অভয়ারণ্য; আবার চুনতি সংরক্ষিত বনও দেখেছে। আর শেষে কক্সবাজারে তো সমুদ্রের সাথেই দেখা - জোয়ারের সময় বড় বড় ঢেউ দেখেছে। এভাবে তারা আলোচনা করে বাংলাদেশের বিশেষ বিশেষ ভূমিরূপের একটি তালিকা বানালো। তালিকা তৈরি হলে তারপর তারা ঠিক করলো এসকল জায়গা বাংলাদেশের মানচিত্রে চিহ্নিত করবে।

আনুচিং বললো আপা আমাদের পাহাড়ী এলাকাগুলো দেখতে তো খুবই সুন্দর কিন্তু শীতকালে পানির খুব কষ্ট, আবার বর্ষাকালে পাহাড়ী ঢল নামে-কি যে সমস্যা তখন! আবার কোনো কোনো সময় তো বেশি বর্ষা হলে পাহাড় ধ্বসও হয়।

খুশি আপা বললেন আনুচিং যেমনটা বলল তেমন অনেক জায়গায়ই বিশেষ বিশেষ প্রাকুতিক দুর্যোগ দেখা দেয়। এগুলোর সাথেও কিন্তু ভূমিরূপ জড়িত। তখন নীলু বললো, আপা যেমন নদীর সাথে বন্যা? খুশি আপা বললেন, নীলু তুমি একদম ঠিক বলেছ। চলো আমরা সেগুলোও খুঁজে বের করি।

তখন তারা সবাই দলে বসে এক এক দল একটি করে বিভাগ বেছে নিল। এবারে প্রত্যেক দল একটা করে বিভাগের ভূপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য মানচিত্রে রং এর মাধ্যমে চিহ্নিত করলো এবং সেখানকার প্রধান প্রধান প্রাকৃতিক দুর্যোগ গুলোর তালিকা তৈরি করলো যার সাথে ভূমিরূপেরও সম্পর্ক আছে।

চলো আমরাও ওদের মতো করে ভূমিরূপের মানচিত্র বানাই ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের তালিকা বানাই।

কাজ শেষ হলে তা ওরা সবাই একে একে দলের সবাইকে দেখালো এবং কী কী বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছে তা বললো। অন্যদের মন্তব্য শুনে ও নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ওরা তালিকাটা যতটা সম্ভব পরিপূর্ণ করে উপস্থাপন করলো।

খুশি আপা সবার কাজ দেখে তাদের অভিনন্দন জানালেন, এবং বললেন চলো আমরা এখন এমন একটা খেলা খেলবো যার মাধ্যমে এখানে বসেই পৃথিবীর সব মহাদেশের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিরুপ ও স্থান ঘুরে আসা যায়।সবাই আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল।

খুশি আপা তখন একটা ভূমিরুপ লুডো বোর্ড নিয়ে আসলেন। সবাই তো দেখে অবাক, এ আবার কেমন লুডো? আপা বললেন, আমরা তো আগেই দেখেছি নিয়ম মেনে খেললে সব খেলা সুন্দর মতো হয়, তাই না? এ খেলাটিও আমরা কিছু নিয়ম মেনে খেলবো। তোমরা সবাই ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গোল হয়ে বসে পড়ো।

দলীয় ভাবে লুডো খেলার নিয়ম

- প্রতিটি বোর্ডে দুটো দল খেলতে পারবে। প্রতি দলের একজন ক্যাপ্টেন থাকবে।
- টসের মাধ্যমে নির্ধারণ হবে, কোন দল আগে খেলা শুরু করবে।
- ১ পড়লে বিশ্বভ্রমণের যাত্রা শুরু করতে পারবে, তার আগে নয়। যাত্রা শুরুর স্থান ঢাকা।
- দলের যে কোন একজন খেলা শুরু করবে। কে শুরু করবে তা ক্যাপ্টেন নির্ধারণ করবে।
- খেলা চলাকালীন যে কোন সময় খেলোয়াড় বদল হতে পারবে। তবে একজন বদলি হলে সে পুনরায় আর খেলার সুযোগ পাবে না।
- খেলাটির যেসব নিয়ম বলা আছে সেই অনুসারে খেলতে হবে। (নিয়মাবলি পরিশিষ্ট-২)
- খেলা সঠিক নিয়মে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্যে প্রত্যেক বোর্ডের একজন রেফারি নির্ধারণ করতে হবে। রেফারি কে হবে তা দুই দলের ক্যাপ্টেন ঠিক করবে। যে রেফারি হবে সে খেলায় অংশ নিতে পারবে না।
- ১০০ পয়েন্ট এ আছে আন্দামান ও নিকোবর দীপপুঞ্জ এখানে সকল খেলোয়াড়কে পৌঁছাতে হবে। যে দল সর্বপ্রথম ১০০ পয়েন্টে পৌঁছাবে সেই দল জয়ী হবে।

ফাতেমা বললো, আপা আমরা যদি দুই জন মিলে খেলাটি খেলতে চাই তাহলেও তো খেলতে পারবো-তাই না? খুশি আপা বললেন, নিশ্চয় পারবে। পরিশিষ্ট-২ এ দেওয়া লুডোর নমুনা অনুযায়ী আমরা বিশ্ব মানচিত্র সংগ্রহ করে একটি বিশ্বভ্রমণ লুডো বানিয়ে নিতে পারি। এরপর পরিশিষ্ট-৩ তে নিয়মাবলিগুলো দেখে খেলাটি খেলতে পারি। তারপর সবাই লুডোটি বনিয়ে আনন্দঘন পরিবেশের মধ্যে দিয়ে খেলা শেষ করলো।

চলো যাই শিক্ষাভ্রমণ

পরের দিন ক্লাসে নীলা হারুনকে বললো আমাদের বাংলাদেশে তো অনেক ধরণের ভূমিরূপ আছে আমরা তো সেসব জায়গার কোনো একটিতে শিক্ষাভ্রমণে যেতে পারি! মিলি বললো চল তাহলে খুশি আপা ক্লাসে আসলে তাকে এ বিষয়ে বলি। ইতোমধ্যে খুশি আপা ক্লাসে আসলেন। নীলা তখন তাদের মনের ইচ্ছা আপাকে বললো। আপা শুনে বললেন এ তো খুবই ভালো প্রস্তাব। এ তো অনেক বড় আয়োজন। তখন তারা সবাই মিলে আলোচনা করে ঠিক করলো এ আয়োজনে তাদের কার কার সাহায্য লাগবে এবং কি কি আয়োজন করতে হবে।

চলো ওদের মতো করে আমরাও একটা শিক্ষাভ্রমণের আয়োজন করি।

আয়োজন কি সম্পূর্ণ হলো চলো মিলিয়ে দেখি

স্থান নির্বাচন	দিন, তারিখ, সময়	যানবাহন	শিক্ষকমণ্ডলী	খাবার	ফি
১. ২. ৩.			১. ২. ৩.	সকাল: দুপুর: রাত:	

খুশি আপা বললেন, বাহ তোমরা তো বেশ ভালোই আয়োজন করেছ। সালমা বললো, আপা আমরা বিজ্ঞান বিষয়ে পিকনিক আয়োজন করেছিলাম তো আগে। খুশি আপা বললেন, ও আচ্ছা খুব ভালো কিন্তু পিকনিক ও শিক্ষাসফর কি এক?

নাজিফা বললো, না আপা, শিক্ষাসফরে আমরা কোনো জিনিস দেখার মাধ্যমে শিখতে পারি। আরমান বললো আপা আমরা অনেক ধরণের ভূমিরূপ সম্পর্কে ছবি ও নানা মাধ্যমে জেনেছি, এখন যদি সেগুলো সরাসরি দেখি তাহলে আমাদের জানা জিনিসের সাথে সেটা মিলিয়ে দেখতে পারবো। রিপন বললো তাহলে আপা আমরা যা যা দেখবো তার মধ্যে যদি নতুন কোনো কিছু খুঁজে পাই সেটা আমাদের তৈরি ভূমিরূপ অভিধানে লিখতে পারি। সালমা বললো, আমরা তো সফরে গিয়ে অনেক কিছু দেখব, কত নতুন কিছু জানতে পারবো। প্রত্যেকে আমরা একটা করে ভ্রমণ ডায়েরি তৈরি করতে পারি। আর তাতে শিক্ষাসফরে নতুন যত ভূমিরুপ দেখবো তার ছবি তুলে বা একে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিখে রাখবো। আর যখন খুশি সেগুলো দেখতে পারো। রনি বললো, বাহ এটাতো খুবই ভালো প্রস্তাব, কারণ আমরা যখন বড় হয়ে যাবো তখন এগুলো দেখে কতই না মজা পাবো! খুশি আপা বললেন, তোমরা খুব ভালো কথা বলেছ। চলো তাহলে আমরা আমাদের শিক্ষাসফরের আয়োজন শুরু করি। সবাই হাততালি দিয়ে কাজ শুরু করলো।

সুমনের বানানো ভ্রমণ ডায়েরি

সালমার ভ্রমণ ডায়েরি

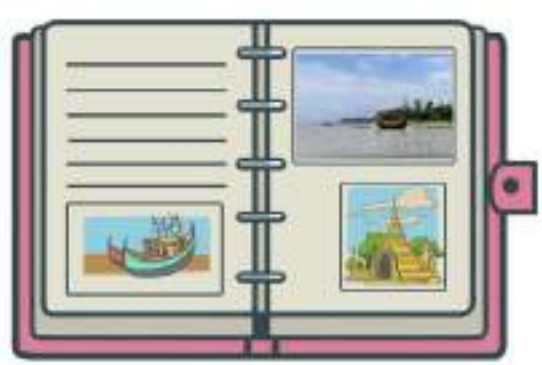

তোমরাও কিন্তু সবাই সফর শেষে ভ্রমণ ডায়েরি
তৈরি করে বন্ধুদের দেখাতে ভুলো না।

সামাজিক কাঠামো

শ্রেণিকক্ষে ঢুকে খুশি আপা বললেন কাঠামো সম্পর্কে তো আমাদের কিছু ধারনা হলো। চলো এবার আমরা সামাজিক কাঠামো নিয়ে কাজ করি। কেমন হয় যদি আমরা একটা গল্প দিয়ে কাজটা শুরু করি।

সবাই খুশি হয়ে উঠলো। খুশি আপা বললেন চলো তাহলে বই থেকে ধর্মগোলার গল্পটি পড়ি। কে শুরু করতে চাও?

মিলি উঠে দাড়ালো এবং পড়তে শুরু করলো।

ধর্মগোলার গল্প

ডেমরা একটা গতানুগতিক গ্রাম। গ্রামের জীবনজীবিকার প্রধান অবলম্বন কৃষি। গ্রামের মানুষ একতাবদ্ধ, সমাজের রীতিনীতি ও নিয়মকানুন এবং পরোপকারের সংস্কৃতি মেনে চলে। যেকোন উৎসব একসাথে উৎযাপন করে। একবার খুব বন্যা হয়। গোটা গ্রাম ডুবে যায়। মানুষ আশ্রয় নেয় স্কুলের পাকা দালানে। খাবারের সমস্যা ছিলো। সরকারি ত্রাণসামগ্রী, এন.জি.ও থেকে প্রাপ্ত রসদ ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সহায়তা পেয়ে গ্রামবাসী বন্যা মোকাবেলা করে। মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাওয়ায় ফাঁকা বাড়ি-ঘরে চোরের উপদ্রব বেড়ে যায়। আইন-শৃংখলা রক্ষার জন্য সদর থেকে পুলিশ আসে। বন্যার সময়ে ত্রান বিতরণে ইউনিয়ন পরিষদকে তৎপর দেখা যায়। শিক্ষা বিভাগের তৎপরতায় লেখাপড়ার ক্ষতি খানিকটা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়। আসল সমস্যা শুরু হয় তার পরে। বন্যায় অপুষ্ট ধানসহ সকল ফসল ডুবে গিয়েছিলো। গুদামে থাকা ধানও নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। ফলে আকস্মিকভাবে খাদ্য সংকট দেখা দেয়। গ্রামে ঐতিহ্যবাহী সমাজ টিকে ছিলো। সবাই বিশ্বাস করতো একা একা ভালো থাকা যায় না। সব মানুষের উপকারের জন্য কাজ করতে পারা কে মানুষ গর্বের বিষয় বলে ভাবতো। ভালো কাজ মনে করতো। গ্রামের সব মানুষ আলোচনায় বসলেন। একজন বললেন, দু'একজন ছাড়া আমাদের সবারই খাবার বাড়ন্ত (শেষ হয়ে যাচ্ছে)। একা একা এই সমস্যা মোকাবেলা করা কঠিন হবে। কারণ কারো কাছে চাল আছে, কারো কাছে ডাল, কারো বা আছে সবজি। তাদের কারোর কাছেই খাবার তৈরি করার মতো সব কিছু একসাথে নেই। কিন্তু আমরা প্রত্যেকে সবার চাল, ডাল, সবজি, তেল, লবন ইত্যাদি একসাথে করে রান্না করতে পারি। তারপর প্রত্যেক পরিবারের প্রয়োজন অনুযায়ী বিতরণ করতে পারি, তাহলে আপাতত সমস্যার সমাধান করা যাবে। সবাই হয়ত সমান পরিমাণ খাদ্যপণ্য দিতে পারবেনা, যারা পারবেনা তারা শ্রম দেবে, জ্বালানী সংগ্রহ করবে, রান্নায় সাহায্য করবে বা বিতরণের কাজে লাগবে। সবার অংশগ্রহণটাই আসল কথা। খাদ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাবে শিশু, সন্তানসম্ভবা নারী, অসুস্থ ও বৃদ্ধ। তারপর অন্যরা। এভাবে সেই সমস্যা বেশ খানিকটা সমাধান করা গিয়েছিলো। তবে এরকম ঘটনা তো আবারও ঘটতে পারে। তখন কী হবে? এজন্য সমাজের সব মানুষ আবার বসলেন একসাথে। তারা ঠিক করলেন, তারা আকালের (দুর্ভিক্ষ/অভাব) সময়ের জন্য ফসলের একটি গোলা তৈরি করবেন। এই গোলার নাম দেয়া হলো ধর্মগোলা। গ্রামে নতুন ধান উঠলে প্রত্যেক পরিবার থেকে একমন ধান/চাল, গম, ডাল, সরিষা বা অন্য কোন খাদ্যশস্য একসাথে করে একটা স্থানে রাখা হবে। আকালের সময় যে যার প্রয়োজনমতো সেখান থেকে ধান/চাল ধার করবে। আকাল পার হয়ে গেলে আবার যে যা নিয়েছিলো তা ফেরৎ দিয়ে দেবে। ফলে ধর্মগোলায় সবসময় সংকটের জন্য ধান/চাল মজুদ থাকবে।

ধান/চাল সংরক্ষনের জন্য গোলাঘর তৈরি করা হয়। সমাজের প্রতিটা পরিবার এই ধর্মগোলা সমিতির সদস্য। একটা পরিচালন কমিটি করা হয়। পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও সমসংখ্যায় এই কমিটির সদস্য হয়। ধান সংগ্রহ, সংরক্ষণ, ধার দেওয়া ও ধার শোধ করার জন্য নানান নিয়মকানুনও তৈরি হয়। এই ব্যবস্থা খুব ভালো কাজ করেছিল। সামাজিক কাঠামোকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে সংকট মোকাবেলা করা যায়- এ তারই একটা উদাহরণ। বাংলাদেশের নানান প্রান্তে এই উদ্যোগকে রাইস ব্যাংকও বলা হয়।

এবারে চলো আমরা নিচের ছক ব্যবহার করে ধর্মগোলা গল্পে সমাজের কী কী প্রতিষ্ঠান ও আইন-কানুনের কথা বলা হয়েছে তা খুঁজে বের করি।

ক্রম	কাজ / ভূমিকার নাম	সমাজের প্রতিষ্ঠান বা মূল্যবোধ-রীতিনীতির নাম
১.	গ্রামের মানুষেকে একতাবদ্ধ হতে কী সহায়তা করেছিলো?	সমাজের নিয়ম-কানুন, রীতিনীত, পরোপকারের সংস্কৃতি
২.	বন্যার সময় মানুষ কোথায় আশ্রয় নিয়েছিলো?	
৩.	ত্রাণ সামগ্রী কার কাছ থেকে এসেছিলো?	
৪.	ত্রাণ সামগ্রী কে বিতরণে তৎপর ছিলো?	
৫.	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজ কে করে?	
৬.	পড়ালেখার ক্ষতি কার তৎপরতায় খানিকটা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছিল?	
৭.	গ্রামে কী টিকে ছিল?	
৮.	ধর্মগোলা কারা মিলে তৈরি করেছিলো?	

সবাই উপরের ছকটি ব্যবহার করে গল্পে সমাজের যে সকল প্রতিষ্ঠান ও নিয়ম-কানুন, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের কথা বলা আছে তা চিহ্নিত করলো।

চলো আমরাও ওদের মতো করে উপরের ছকটি ব্যবহার করে ধর্মগোলা গল্পে উল্লিখিত বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ চিহ্নিত করি !

খুশি আপা বললেন, আমরা খুব সুন্দরভাবে গল্পে উল্লিখিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, মূল্যবোধ, সংস্কৃতি ও রীতি-নীতি চিহ্নিত করতে পেরেছি। এবার চলো সমাজ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জেনে নিই।

সমাজ থেকে সামাজিক কাঠামো

সমাজ কী?

কাদের নিয়ে, কী কী উপাদানে ও কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটা সমাজ গড়ে ওঠে?

এইসব প্রশ্নের উত্তর বোঝার জন্য আমাদের আগে সামাজিক কাঠামো সম্পর্কে জানতে হবে । এর মাধ্যমে সমাজ কীভাবে সংগঠিত হয়— তা বুঝতে পারব।

খুশি আপা বললেন, সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মানুষ একে অপরের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করে। এইসব প্রতিষ্ঠান এবং সেখানে মানুষে মানুষে মিথস্ক্রিয়ার ধরণকে এক কথায় সামাজিক কাঠামো বলা যায়।

এবার চলো, আমরা 'ধর্মগোলা' গল্পটি থেকে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং মানুষে-মানুষে পারস্পরিক আদান-প্রদান বা মিথস্ক্রিয়ার অংশগুলো খুঁজে বের করি।

প্রথমেই নিসর্গ বলল, ধর্মগোলা গল্পে আমরা সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে অনেকগুলো পরিবারকে দেখতে পাই। বন্যার পরে তারা পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে নিজেদের খাবারের সংকট কাটিয়ে ওঠে। এভাবে তাদের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া ঘটেছিল। অন্বেষা বলল, প্রতিটি পরিবার নিজেদের চাল-ডাল-সবজি-তেল-লবণ, যার কাছে যা ছিল, তা-ই সমাজের সকলের জন্যে এক জায়গায় জড়ো করেছিল। এমনকি যাদের কাছে কোনো খাবার ছিল না, তারাও পরিশ্রম করে সমাজের কল্যাণে ভূমিকা রেখেছিল। এর মাধ্যমে ডেমরা গ্রামে মানুষে মানুষে মিথস্ক্রিয়া ঘটেছে।

গণেশ বলল, গল্পে কেবল পরিবার নয়, আরও কিছু প্রতিষ্ঠান মানুষের উপকারে কাজ করেছে। যেমন: ইউনিয়ন পরিষদ একটি প্রতিষ্ঠান, সে ত্রাণ বিতরণ করেছে। সেই ত্রাণ এসেছে অন্য একটি প্রতিষ্ঠান বা সরকারের কাছ থেকে। মোজাম্মেল বলল, ঠিক তাই। স্কুল, শিক্ষা বিভাগ, পুলিশ— এসব প্রতিষ্ঠানও সমাজের সকলের মঙ্গলের জন্য কাজ করেছে। শিহান বলল, ধর্মগোলার ব্যবস্থাপনার জন্য আবার নতুন একটা সামাজিক প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছে—ধর্মগোলা সমিতি। এই প্রতিষ্ঠানও ডেমরা গ্রামের মানুষের মঙ্গলের জন্য কাজ করেছে।

আনাই বলল, এভাবেই ধর্মগোলা গল্পে সমাজের মানুষে-মানুষে, মানুষে-প্রতিষ্ঠানে, প্রতিষ্ঠানে-প্রতিষ্ঠানে পারস্পরিক আদান-প্রদান বা মিথস্ক্রিয়া ঘটেছে।

খুশি আপা ওদের উত্তর শুনে দারুণ খুশি হলেন। বললেন, কী চমৎকার করে বুঝিয়ে বললে! এবার তাহলে বলো তো, ডেমরা গ্রামের মানুষ আর প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার এইসব মিথস্ক্রিয়া গড়ে উঠল কীভাবে? কেন তারা পারস্পরিক যোগাযোগ বা মিথস্ক্রিয়া করল?

বুশরা বললো, আমি জানি! নিজেদের মঙ্গল এবং অন্যদের উপকার করার জন্য! তখন খুশি আপা বললেন, নিজেদের মঙ্গল সবাই চায়, কিন্তু কেন ওরা অন্যের উপকার করতে চাইল? নন্দিনী বলল, ডেমরা গ্রামের দু'একটি পরিবারের কাছে ঠিকঠাক খাবার ছিল, কিন্তু বাকি সকলের কাছে সবকিছু ছিল না। অনেকের কাছে কিছুই ছিল না। ওরা দেখল, সকলেরটা মিলিয়ে-মিশিয়ে একসঙ্গে খাওয়ার ব্যবস্থা হলে সকলেরই উপকার হয়। তাই নিজের ভালো করতে গেলে অন্যের ভালোটুকুও দেখতে হবে। আনুচিং বলল, নিজের ভালোর জন্য সবাই অন্যের উপকার করেছে। সালমা বলল, কিন্তু ওই গ্রামের কারোর কারোর কাছে খাবার ছিল, তারা

কেন অন্যের উপকার করল! ফ্রান্সিস বলল, তাই তো! আবার কারোর কাছে কিছুই ছিল না, তাদের জন্যও কেন খাবারের ব্যবস্থা করল? সবাই গভীর চিন্তায় পড়ে গেল। হঠাৎ জাভেদ বলে উঠলো, পেয়েছি! কারণ ওরা বিশ্বাস করত একা একা ভালো থাকা যায় না! এবং ওরা অন্য মানুষের উপকার করতে গর্ব বোধ করত! ভালো কাজ মনে করত। খুশি আপা জানতে চাইলেন, কেন ওরা অন্যের উপকার করাকে ভালো কাজ বলে মনে করত বলে মনে হয়? মিলি বলল, নিশ্চয়ই ওরা অনেকদিনের অভিজ্ঞতায় দেখেছে, সমাজে কেউই সবকিছু একা করতে পারে না। তাই সকলে মিলেমিশে ভালো থাকতে পারলেই সমাজের মঙ্গল হয়, সকলের কল্যাণ হয়।

খুশি আপা বললেন, দারুন! ঠিক তাই! আর এই যে মানুষের নানারকম বিশ্বাস; কোন কাজটা ভালো আর কোন কাজটা মন্দ—এইসব ধারণাগুলো সমাজে মানুষের আচরণ কেমন হবে তা ঠিক করে দেয়। অধিকাংশ মানুষই সমাজের কাছে 'ভালো' হিসেবে পরিচিত হতে চায়। তাই তারা সমাজ যে কাজগুলোকে ভালো বলে মনে করে, সেগুলো করার চেষ্টা করে। এই সব বিশ্বাস এবং ভালো-মন্দের বোধকে আমরা মূল্যবোধ বলে জানি। আবার সমাজে এমন কিছু নিয়ম আছে যেগুলো মানুষ বহু বছর ধরে পালন করে আসছে। সমাজের সংস্কৃতির অংশ হিসেবে মানুষ সাধারণত কোন রকম প্রশ্ন ছাড়াই এ সকল নিয়ম পালন করে; সেসবকে আমরা রীতি-নীতি বলে জানি। যেমন: শিক্ষক ক্লাসে এলে উঠে দাঁড়ানো, কারোর সঙ্গে দেখা হলে কুশল বিনিময় করা, অতিথিকে আপ্যায়ন করা।

'ধর্মগোলা' গল্পে যেমন দেখেছি, শিশু, সন্তানসম্ভবা নারী, অসুস্থ এবং বৃদ্ধদের আগে খাবার দেওয়া হয়েছিল। আবার সমাজের প্রত্যেকটা পরিবার ছিল ধর্মগোলা সমিতির সদস্য। পরিচালনা কমিটিতে পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও সমান সংখ্যায় কমিটির সদস্য হয়েছিল। এই বিষয়গুলো প্রচলিত মূল্যবোধ ও রীতিনীতি থেকে এসেছে। আবার ধান সংগ্রহ, সংরক্ষণ, ধার দেওয়া ও ধার শোধ করার জন্য নানান নিয়মকানুন তৈরি হয়েছিল, সেগুলোও সমাজের মূল্যবোধ ও রীতিনীতির আলোকে তৈরি হয়েছে। এমনি করে এইসব সামাজিক রীতিনীতি ও মূল্যবোধগুলোর মাধ্যমে দেশের আইন-কানুনও তৈরি হয়। সমাজের মানুষ এসব মেনে চলে। নইলে নানারকম শাস্তিও পেতে হয়।

আসিফ বলল, হ্যাঁ, আপা। ধর্মগোলা গল্পে আমরা দেখেছি, যখন গ্রামে চোরের উপদ্রব বেড়ে গিয়েছিল, তখন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশ এসেছিল। পুলিশ নিশ্চয়ই চোরদের ধরে নিয়ে শাস্তির ব্যবস্থা করেছিল।

সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মাঝে দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা পারস্পরিক সম্পর্ক বা সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সুশৃঙ্খল আন্তঃসম্পর্ককে বলা হয় সামাজিক কাঠামো। এর মধ্যে মানুষ একত্রে বসবাস করে ও মানুষে-মানুষে মিথস্ক্রিয়া বা আদান-প্রদান ঘটে; মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, নিয়মকানুন ও রীতিনীতি তৈরি হয় এবং এগুলোর মাধ্যমেই আবার মানুষে-মানুষে মিথস্ক্রিয়ার ধরণ নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, নিয়মকানুন ও রীতিনীতি ইত্যাদি মানুষের আচার-আচরণ কেমন হবে তা ঠিক করে দেয়।

ছবি:

খুশি আপা বললেন, এবার চলো, আমরা প্রত্যেকে নিজের এলাকার সমাজ থেকে কোনো একটি সম্মিলিত উদ্যোগ বা এরকম একটি বিষয় চিহ্নিত করি। তারপর সেই উদ্যোগ বা বিষয় থেকে মানুষে-মানুষে, মানুষে-প্রতিষ্ঠানে, প্রতিষ্ঠানে-প্রতিষ্ঠানে মিথস্ক্রিয়ার অনুসন্ধান করি। আমরা নিচের ছকটিতে সেই মিথস্ক্রিয়ার বর্ণনা লিখব:

এরপর খুশি আপা বললেন, আচ্ছা বলো তো, আমাদের দেশের ছেলে আর মেয়েদের পোশাক কেমন?

সবাই একযোগে বলে উঠল, মেয়েদের ফ্রক, কামিজ, শাড়ি আর ছেলেদের শার্ট, প্যান্ট, লুঙ্গি, পাঞ্জাবি। খুশি আপা বললেন, ঠিক বলেছ, কিন্তু মেয়েদের আর ছেলেদের পোশাক কেমন হবে তা কে ঠিক করল?

নীলা বলল, আমাদের বাবা-মায়ের কাছ থেকে আমরা শিখি। খুশি আপা বললেন, বাবা-মা কী করে জানলেন, কার কোন পোশাক পরা উচিত? শামীমা বলল, দাদা-দাদী, নানা-নানীদের কাছ থেকে!

খুশি আপা হেসে বললেন, আবারও যদি একই রকম প্রশ্ন করি, দাদী-নানীরা জানলেন কীভাবে? তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই দাদী-নানীদের বাবা-মায়ের কথা বলবে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পোশাকের কাট-ছাঁটে একটু বদল হলেও ছেলে-মেয়ের পোশাকের একটা নির্দিষ্ট ধরণ এবং ভিন্নতা আগে থেকেই আছে। আমরা সাধারণত সেগুলো মেনে চলি। তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আমাদের জন্মের আগেই আমাদের পোশাক কেমন হবে তা নির্ধারিত হয়ে যায়।

এমনিভাবে আমাদের জন্মের আগেই সমাজ কীভাবে সংগঠিত হবে বা সামাজিক কাঠামো কেমন হবে তা নির্ধারিত হয়ে আছে। সামাজিক কাঠামো আমাদের আচার-আচরণকে নির্দিষ্ট করে দেয়। আমাদের কোন পরিস্থিতিতে কী করা উচিত, কোথায় কী বলা উচিত, কেমন পোশাক পরা উচিত, কার সাথে কেমন আচরণ করা উচিত— এসবের প্রায় সবই সামাজিক কাঠামো দ্বারা পূর্ব নির্ধারিত। আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা অনুসরণ করি মাত্র। তবে সামাজিক কাঠামোও অপরিবর্তনীয় নয়। খুব ধীরে হলেও এই কাঠামো বদলায়।

- পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত সামাজিক দল ও সকল প্রতিষ্ঠানসমূহ, যার মধ্যে মানুষ বাঁচে, বাড়ে ও এর অংশ হয়ে ওঠে— এই সবকিছুর সম্মিলিত রূপকে সামাজিক কাঠামো বলা যায়। এইসব সামাজিক দলের মধ্যে থাকে পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ক্লাব ইত্যাদি। এর মাধ্যমে মানুষে-

মানুষে সর্ম্পক তৈরি হয়, এই সম্পর্ক সমাজে সম্প্রীতির বন্ধন গড়ে তোলে।

- সামাজিক কাঠামো মানুষকে সামাজিক নিরাপত্তা দেয়, নিজের অবস্থানের উন্নয়ন ঘটানো এবং অন্যদের কাছে নিজেকে উপস্থাপন করার সুযোগ দেয়। এখানে ব্যক্তি নিজের আত্মীয়-প্রতিবেশীর গন্ডি পেরিয়েও অপরিচিত গন্ডির মানুষের সঙ্গে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় লিপ্ত হওয়ার পরিসর পায়। এর মাধ্যমে সে সমষ্টির অংশ হিসেবেও সে নিজেকে উপস্থাপন করে।
- সামাজিক কাঠামোর উদ্দেশ্য একটা দলে বসবাসরত মানুষের সম্মিলিত লক্ষ্য পূরণ করা। সবাইকে সমাজের উন্নয়নে ভূমিকা পালন করার যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে সহযোগিতা করা। সমাজের সংস্কৃতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে সাহায্য করা।

ধরা যাক, শাপলা বার বছরের একটি মেয়ে। যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী। সে নিজেকে একজন স্বতন্ত্র বা আলাদা ব্যক্তি হিসেবে বুঝতে শিখছে। শাপলা স্কুলের ফুটবল দলে যোগ দিয়েছে। কারণ সে খেলাটা উপভোগ করে। এভাবে খেলতে খেলতে তার কিছু বন্ধু তৈরি হয়। সময়ের সাথে সাথে, এই ফুটবল দলটি শাপলাকে একজন ভাল খেলোয়াড় হিসেবে দেখতে পায়। আবার একইসাথে সামাজিকভাবে একজন দলীয় খেলোয়াড় (টিমমেট) হিসেবে গড়ে তোলে। তার দলের খেলোয়াড়, কোচ, শিক্ষক, অন্য দলের খেলোয়াড়, ফুটবলপ্রিয় দর্শকদের সাথে যোগাযোগের মধ্য দিয়ে তার ব্যক্তিগত বিকাশ ঘটে। এই বিকাশ একজন ব্যক্তি হিসেবে তাকে অনন্য (অন্যদের চেয়ে আলাদা) করে তোলে। অন্যদিকে শাপলার বোন নাজিফা বিজ্ঞান ক্লাবের সদস্য হয়। তার বন্ধু, পরিচিত জন, যোগাযোগ সবই বিজ্ঞান বিষয়ে আগ্রহী মানুষ ও প্রতিষ্ঠানের সাথে। ফলে, একই পরিবারের মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও কেয়ার ব্যক্তিগত বিকাশ ঘটে শাপলার চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে। দুই বোনের সামাজিক যোগাযোগ ও মিথস্ক্রিয়ায় অর্থাৎ সামাজিক কাঠামোর উপাদানে ভিন্নতা থাকার কারণে দুই জন দুই রকমের মানুষ হিসেবে গড়ে উঠেছে। এরকম ঘটনা সমাজের সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায়। যার মধ্য দিয়ে বোঝা যায়, সামাজিক কাঠামো ব্যক্তি ও সমাজের মানুষের জন্য কতটা শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে।

সামাজিক কাঠামোর উপাদানসমূহ

সামাজিক কাঠামো যেসব উপাদানে তৈরি হয়, সেগুলোকে মোটাদাগে দুটি ভাগ করা যায়:

১. **সামাজিক বিধি:** এর মধ্যে রয়েছে সমাজে প্রচলিত রীতিনীতি, মূল্যবোধ, বিশ্বাস ইত্যাদি। এগুলো মানুষের চিন্তা ও সামাজিক আচরণ কেমন হবে তা নির্ধারণে ভূমিকা পালন করে।

২. **সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও দল:** এখানে রয়েছে, পরিবার, শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রচার মাধ্যম, সরকার ও রাষ্ট্র— যাদের মাধ্যমে সামাজিক কাঠামো নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত হয়।

মানুষে-মানুষে সামাজিক মিথস্ক্রিয়া বা যোগাযোগের মাধ্যমে সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও দলের সৃষ্টি হয়। এই প্রতিষ্ঠান ও দলগুলো সামাজিক কাঠামোর ভিত্তি। একজন মানুষ একই সঙ্গে সামাজিক কাঠামোর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও দলে অবস্থান করে। সেখানে সে নিজের অবস্থান অনুযায়ী সমাজে প্রচলিত রীতিনীতি, মূল্যবোধ, বিশ্বাস ইত্যাদির আলোকে ভূমিকা পালন করে।

আমাদের শরীরের যেমন চোখ, নাক, মুখ. কান, হাত, পা, মস্তিস্ক, ফুসফুস, হৃদপিন্ড ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে। এগুলোকে একসঙ্গে মিলিয়ে মানব শরীর তৈরি হয়। এরা সবাই কাজ করলে আমোদের শরীর ঠিকঠাক কাজ করে। এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো বিশেষভাবে আমাদের শরীরে বিন্যস্ত আছে। এই বিন্যাসকে আমরা শারীরিক কাঠামো বলতে পারি।

তেমনি সমাজের বিন্যাসকে সামাজিক কাঠামো বলতে পারি। কিন্তু সমাজ হলো একটি বিমূর্ত বিষয়, তাকে চোখে দেখতে পাই না; বলতে পারি না, ওই দেখো সমাজ যাচ্ছে। কিন্তু ব্যক্তি বা পরিবারকে দেখতে পাই। দলগুলোকে দেখতে পাই। ব্যক্তি এবং দল মিলে সমাজ তৈরি হয়। ব্যক্তির আলাদা আলাদা অবস্থান। কেউ বাবা, কেউ মেয়ে, কেউ শিক্ষক। আছে ধনী-দরিদ্র. নারী-পুরুষ, শিশু-বয়োজ্যোষ্ঠ। তাদের ভূমিকা বা কাজও আলাদা আলাদা। সমাজে রয়েছে আলাদা আলাদা সংস্কৃতি, আলাদা আলাদা পরিচয়, আলাদা আলাদা মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের ব্যক্তি এবং দল। এইসব দল, প্রতিষ্ঠান, এখানে ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকা, মূল্যবোধ, বিশ্বাস ইত্যাদি সমাজ তৈরির যাবতীয় উপাদান সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত হয়ে সামাজিক কাঠামো তৈরি করে।

সামাজিক অবস্থান

একজন মানুষের বয়স, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, তার পরিচিতি, খ্যাতি, পদ, শিক্ষা-দীক্ষা-সংস্কৃতি, লিঙ্গ, পারিবারিক ঐতিহ্য ইত্যাদি তার সামাজিক অবস্থান তৈরি করে। সমাজে বা একটি দলের মধ্যে একজন ব্যক্তি কতটা সম্মান বা গুরুত্ব পাবেন তা তার সামাজিক অবস্থানের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়।

সামাজিক ভূমিকা

কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে সমাজ কোন বিশেষ মানুষের কাছে যে মূল্যবোধ, দায়িত্বশীলতা ও আচরণ প্রত্যাশা করে তাকেই সাধারণভাবে সামাজিক ভূমিকা বলা হয়। ভিন্ন ভিন্ন মানুষ সমাজে তার অবস্থান অনুযায়ী ভিন্ন ভন্ন দায়িত্ব পালন বা আচরণ করে। মানুষ সাধারণত এসব কাজ করার সময়, সমাজ তার কাছে যে বা আচরণ প্রত্যাশা করে তা পূরণ করার চেষ্টা করে। সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তন হলে সামাজিক ভূমিকারও পরিবর্তন হয়।। যেমন সমাজ একজন খেলোয়াড়ের কাছ থেকে যা আশা করে, একজন পরিচ্ছন্নতাকর্মীর কাছ থেকে তা আশা করে না। সমাজ ছেলে এবং মেয়েদের কাছে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক ভূমিকা প্রত্যাশা করে। তবে সমাজের প্রত্যাশার বাইরে গিয়েও তাদের ভূমিকা পালনের সক্ষমতা থাকে। তবে শিশু এবং বয়োজ্যেষ্ঠদের সামাজিক ভূমিকাও আলাদা হয়।

সামাজিক নেটওয়ার্ক বা আন্তঃযোগাযোগ

একটি দলের সদস্যদের নিজেদের মধ্যকার মিথস্ক্রিয়া আবার একটি দলের সঙ্গে আর একটি দলের মিথস্ক্রিয়াকে সামাজিক নেটওয়ার্ক বা আন্তঃযোগাযোগ বলে। যেমন: সালমা স্কুলের সক্রিয় নাগরিক ক্লাবের সদস্য। এই কারণে তার স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করার প্রয়োজন হতে পারে। অর্থাৎ একটি ক্লাবের সদস্য হওয়ার কারণে তার আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযোগ ঘটতে পারে। এভাবে সালমা তার ক্লাবের সদস্য হবার কারণে আরো অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কিত হয়ে যায়। এই যে সালমার সাথে বিভিন্ন ধরণের ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ ও সম্পর্কের জাল তৈরি হলো এটাই হচ্ছে সালমা ও তার ক্লাবের সামাজিক নেটওয়ার্ক বা আন্তঃযোগাযোগ।

দল ও প্রতিষ্ঠান

দল ও প্রতিষ্ঠান বলতে সামাজিক সম্পর্কের প্রতিষ্ঠিত ও স্থায়ী ধরণকে বোঝানো হয়। এধরণের কিছু গতানুগতিক দল ও প্রতিষ্ঠান আমরা দেখতে পাই, যেমন পরিবার, সংস্কৃতি, রাজনীতি, আইন, সরকার, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, ধর্ম শিক্ষা। দল ও প্রতিষ্ঠান বৃহত্তর সামাজিক কাঠামো তৈরি করে এবং এখানে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সম্পর্ক তৈরির সুযোগ সৃষ্টি করে। ধরা যাক, খুশি আপার ক্লাসে বিয়াল্লিশ জন শিক্ষার্থী আছে। এর মানে হচ্ছে, খুশি আপা তার বিয়াল্লিশ জন ছাত্র-ছাত্রীর মাধ্যমে প্রায় চুরাশি জন অভিভাবকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে

পারেন। অর্থাৎ বিদ্যালয়ের মাধ্যমে বিয়াল্লিশটি পরিবারের সঙ্গে খুশি আপার যোগাযোগ ও জানাশোনার সুযোগ হয়েছে।

সামাজিক কাঠামো হিসেবে পরিবার

সামাজিক কাঠামোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাথমিক উপাদান হলো পরিবার। একজন মানুষের জন্য প্রথম সামাজিক দল বা সংগঠন হচ্ছে পরিবার। পরিবার একজন ব্যক্তির বিকাশে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে। সে কী খাবে, কীভাবে কথা বলবে, কী পরবে, কী কী কাজ করবে ইত্যাদি পরিবারের মাধ্যমে অনেকাংশে নির্ধারিত হয়। একজন মানুষ পরিবারের মাধ্যমে বুঝতে পারে বৃহত্তর সমাজের মধ্যে তাকে কী ভূমিকা রাখতে হবে, সে কী হবে, কী করলে তাকে ভালো বা খারাপ বলে মনে করা হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সুমনের পরিবার তাকে শেখাল যে, সুমন যদি বাইরের লোকদের সাথে যোগাযোগের সময় নম্র ও ভদ্র থাকে, তাহলে তাকে সবাই ভালো বলবে। সুমন যদি পরিবারের এই শিক্ষা মান্য করে তাহলে সে অন্যদের কাছে ভদ্র ছেলে হিসেবে পরিচিত হবে। আবার সানজিদা যদি তার পরিবারের সদস্যদের সব সময়ে রুক্ষ আচরণ করতে দেখে, সে সেরকম আচরণে অভ্যস্ত হবে। সে তখন সকলের কাছে অভদ্র হিসেবে পরিচিত হবে। লোকে তাকে অপছন্দ করবে। এভাবে পরিবার সামাজিক কাঠামোয় ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকা তৈরি করে।

সামাজিক কাঠামোর উপাদান

সামাজিক কাঠামো নানাভাবে মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে। মানুষের ওপর সামাজিক কাঠামোর এই প্রভাব বুঝতে হলে এর উপাদানগুলো সম্পর্কে আমাদের জানা দরকার। যেমন, পরিবার, সংস্কৃতি, আইন, সরকার, রাষ্ট্র প্রভৃতি। এই উপাদানগুলোকে আবার সামাজিক প্রতিষ্ঠানও বলা হয়। প্রতিটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও ভূমিকা রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো সামগ্রিকভাবে একটি দলগত ঐক্য ও নিরাপত্তার বোধ দেয়। সামাজিক কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে আমরা নিচের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের কথা বলতে পারি।

পরিবার	সংস্কৃতি	আইন	সরকার	রাষ্ট্র

পরিবার: আমাদের শৈশব-কৈশোরে মৌলিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা দেয়।

সরকার: সরকার আইন-কানুন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা যেমন-পুলিশ, আনসার প্রভৃতির মাধ্যমে ব্যক্তিকে সারাজীবন নিরবিচ্ছিন্নভাবে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা দেয়।

রাষ্ট্র: রাষ্ট্র নিজে বৃহত্তর সামাজিক কাঠামোর অংশ । আবার অন্যদিকে, রাষ্ট্র তার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সামাজিক কাঠামোকে পরিবর্তন করতে ভূমিকা রাখে। নাগরিকদের নানান সেবা (শিক্ষা, চিকিৎসা, খাদ্য, বাসস্থান, নিরাপত্তা, যোগাযোগ, বিনোদন প্রভৃতি) প্রদান করার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়।

আইন-কানুন ও মূল্যবোধ, রীতি-নীতি, প্রথা:

সামাজিক কাঠামো স্থানীয় ও জাতীয় আইন-কানুন এবং মূল্যবোধ, রীতিনীতি ও প্রথা দ্বারা পরিচালিত হয়। মানুষ নিজে সামাজিক কাঠামোর অংশ হিসেবে এইসব নিয়মকানুন, মূল্যবোধ, রীতিনীতি ও প্রথাকে মেনে

চলে। জীবনযাপনের নানান বিষয়ে যেমন-ঝগড়া, দ্বন্দ্ব, জমিজমার মালিকানা, উত্তরাধিকার, ও বিভিন্ন সুযোগ সংক্রান্ত বিষয়গুলো এই কাঠামো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

সংস্কৃতি:

সংস্কৃতি হচ্ছে দলগতভাবে কোনো এলাকার মানুষের আচরণের বিশেষ ধরণ। আমাদের জীবনের সাথে সম্পর্কিত প্রায় সব আচরণই আমাদের সংস্কৃতির অংশ। যেমন-আমরা কী ধরণের খাবার খাই, কীভাবে খাই, ভাষা, পোশাক, খেলাধূলা, আচার-অনুষ্ঠান, শিল্প-সংস্কৃতি, ধর্মীয় ও অন্যান্য বিশ্বাসসহ আরো অনেক কিছু। এক এক দেশের বা একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মাঝে সংস্কৃতির পার্থক্য থাকতে পারে। যেমন বাংলাদেশের সমূদ্র উপকূলীয় এলাকায় এক ধরণের সংস্কৃতি, আবার উত্তরবঙ্গ বা পাহাড়ি এলাকায় আবার ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এই সব বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতি নিয়েই আমাদের বাংলাদেশের সংস্কৃতি।

আবার অনেক সময় একটি দেশের সংস্কৃতি অন্য দেশের মানুষের কাছে বিচিত্র বা চমকপ্রদ মনে হতে পারে।

যেমন-

১. ভেনিজুয়েলাতে যদি তোমাকে তোমার কোনো বন্ধুর বাসায় নিমন্ত্রণ করা হয়, আর তুমি যদি ঠিক সময়ে গিয়ে হাজির হও, তাহলে তোমাকে ওরা ভাববে তুমি পেটুক আর লোভী। ঠিক সময়ের চেয়ে একটু দেরি করে যাওয়াটাই সেখানকার সংস্কৃতি।

২. অন্যদিকে চীনে গিয়ে কোনো বন্ধুকে ভুলেও অভিনন্দন জানাতে ফুলের তোড়া উপহার দেয়া যাবে না। কারণ চীনের সংস্কৃতি অনুযায়ী শুধু মৃত মানুষকেই ফুলের তোড়া দেয়ার প্রচলন।

৩. কিন্তু প্রত্যেকের কাছেই তার নিজের সংস্কৃতি তার কাছে খুবই ভালো এবং উপযোগী মনে হয়। এজন্য সংস্কৃতির কোনো ভাল বা মন্দ বিচার করা চলে না। এক দেশের বা ধর্মীয় ও অন্যান্য বিশ্বাসের সংস্কৃতির সাথে অন্য দেশের বা ধর্মীয় ও অন্যান্য বিশ্বাসের কোনো রকম তুলনা করা চলে না। পৃথিবীতে এত বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি আছে বলেই পৃথিবীটা এত সুন্দর মনে হয়।

সমাজ, রাষ্ট্র, সংস্কৃতি, সরকার-আগে কেমন ছিল?

আজ ক্লাসে মিলি দুটি ছবি নিয়ে এসেছে। প্রাচীন কালের ছবি।

প্রাচীন সমাজ জীবন

প্রাচীন সুমেরীয় সভ্যতায় সমাজ জীবনের খণ্ডচিত্র (কল্পিত)

আনাই: দেখো দেখো ! আগের সমাজ এখানকার চেয়ে অনেক ভিন্ন না?

মিলি: হ্যাঁ ঠিকই বলেছ। তাহলে, সে সময়কার রাষ্ট্র, আইন, সংস্কৃতি, ধর্ম এগুলোও কি ভিন্ন ছিল?

সবাই চিন্তায় পড়ে গেলো।

নাজিফা: আচ্ছা, খুশি আপা! এ বিষয়ে একটি অনুসন্ধানী কাজ করলে কেমন হয়?

অনুসন্ধানী প্রজেক্ট

খুশি আপা নিশ্চয়, আমরা কি কি নিয়ে অনুসন্ধান করব সেটা বুঝতে চলো আগে যা শিখেছি সেই ধারণা আরেকটু ঝালাই করে নেই। আমরা বিভিন্ন কাঠামো সম্পর্কে জেনেছি। একেক জন একেকটা নাম বল দেখি, আর ঝটপট বোর্ডে লিখে ফেলো।

সমাজ নদী, সমুদ্র, রাষ্ট্র, মরুভূমি, সমতল ভূমি, ধর্ম পর্বত, সরকার, আইন, সংস্কৃতি,

এবারে এগুলোর মধ্যে কোনগুলো সামাজিক (অর্থাৎ মানুষের তৈরি) আর কোনগুলো প্রাকৃতিক বা ভৌগোলিক কাঠামো তা আমরা নিজেরাই বোর্ডে চিহ্নিত করলাম।

এবারে **অনুসন্ধানী দল তৈরি** করলাম। একেক দল এক একটি কাঠামো নির্বাচন করলাম অনুসন্ধানের বিষয় হিসেবে।

এবারে এই বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য **অনুসন্ধানী প্রশ্ন** তৈরি করলাম (বিজ্ঞানের চোখে চারপাশ দেখি অধ্যায়ের কথা মনে আছে? সেই অনুসন্ধানী কাজ? প্রয়োজন হলে সেটি একটু পড়ে দেখতে পারি আমরা)। অতীতে বিভিন্ন সময়ে এই কাঠামো কিভাবে গড়ে উঠেছে, কাজ করেছে, এখনকার সাথে মিল, অমিল ইত্যাদি নিয়ে প্রশ্ন তৈরি করলাম আমরা। যেমন:

১. প্রাচীন কালে সমাজ কীভাবে গড়ে উঠেছিল? সমাজ কীভাবে কাজ করতো? এখনকার সাথে মিল বা অমিল গুলো কী কী?

২. প্রাচীন সভ্যতায় আইন কেমন ছিল? এখনকার সাথে তার কি মিল বা অমিল আছে?

৩. প্রাচীন সভ্যতায় সংস্কৃতি কেমন ছিলো? বর্তমানের মানুষের সংস্কৃতির সাথে তার উপাদানসমূহের কি মিল বা অমিল আছে?

৪. প্রাচীন সভ্যতায় রাষ্ট্র ব্যবস্থা কেমন ছিলো? বর্তমান সময়ের রাষ্ট্রের সাথে তার কী মিল বা অমিল আছে?

৫. প্রাচীন সভ্যতাগুলো কেন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নদী/সমূদ্র বা কোন জলাশয়ের তীরে গড়ে উঠেছিলো?

৬. ----------

৭. ----------

এগুলো কিছু উদাহরণ মাত্র। এরকম হাজার হাজার প্রশ্ন আমরা নিজেরা পছন্দমত তৈরি করে নিতে পারি।

প্রতিটি প্রশ্ন অনুসন্ধান করতে সেটাকে ভেঙে আরও ছোট ছোট ও সুস্পষ্ট প্রশ্ন তৈরি করে আমরা সেগুলোর উত্তর অনুসন্ধান করে (যেমন-বই পড়ে, সাক্ষাৎকার নিয়ে, পর্যবেক্ষণ করে, ইন্টারনেট থেকে বিভিন্ন ওয়েবসাইট ব্যবহার করে) বের করতে পারবো। যেমন:

প্রশ্ন: প্রাচীন সভ্যতাগুলোতে সংস্কৃতি কেমন ছিলো ? এখনকার সাথে তার উপাদানসমূহের কী কী মিল বা অমিল আছে?

এটা ভেঙ্গে আমরা ছোট প্রশ্ন পেলাম-

অনুসন্ধানের প্রশ্ন-১ প্রাচীন সভ্যতাগুলোর সংস্কৃতি কেমন ছিলো? সেই সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদনগুলো কেমন ছিলো?

এটি অনুসন্ধানের জন্য সবাই এরকম ছক ব্যবহার করল:

সভ্যতা	স্থান	সময়কাল	সাংস্কৃতিক উপাদান বা চর্চা	আদি মানুষের জীবনে এর প্রভাব

খুশি আপা বললেন, অন্যান্য বই, ইন্টারনেট, পত্রিকা, ম্যাগাজিন প্রভৃতি উৎস থেকে যেমন আমরা এ বিষয়ে

তথ্য পেতে পারি তেমনি আবার আমাদের **ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান (অনুসন্ধানী পাঠ)** বইয়ের

অধ্যায় ২- মানুষ ও সমাজ এলো কোথা থেকে

অধ্যায় ৩- সভ্যতার বিকাশ - এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপে নগরায়ন ও রাষ্ট্র

অংশগুলো থেকে এ সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারবো।

অনুসন্ধানের প্রশ্ন-২ পৃথিবীর যে সব দেশে বা স্থানে প্রাচীন সভ্যতাগুলো গড়ে উঠেছিল সেসব স্থানে বর্তমানকালে মানুষের সংস্কৃতি ও তার উপাদানগুলো কেমন?

বিভিন্ন বই পড়ে, ইন্টারনেট থেকে, নিজেরা পর্যবেক্ষণ করে, বড়দের সাক্ষাৎকার নিয়ে তারা তথ্য সংগ্রহ করবে। তথ্য সংগ্রহের জন্য অনুসন্ধানের প্রশ্ন-১ এ ব্যবহৃত ছক এর মত ছক তৈরি করে অনুসন্ধানের প্রশ্ন-২ এর তথ্য সংগ্রহের জন্যও ব্যবহার করা যাবে।

অনুসন্ধানের প্রশ্ন-৩ বর্তমানকালে ও অতীত কালের মানুষের জীবনে সংস্কৃতিগত কী কী মিল অমিল দেখা যায়?

খুশি আপা আরও বললেন যে, **ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান (অনুসন্ধানী পাঠ)** বইয়ের অন্যান্য অংশগুলোও আমাদের অতীতের সামাজিক কাঠামোসমূহ সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে সহযোগিতা করতে পারে। কাজেই সবাই চলো **ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান (অনুসন্ধানী পাঠ)** বইয়ের নিচের অংশগুলো নিয়ে কাজ করি। অংশগুলো হচ্ছে-

অধ্যায় ২- মানুষ ও সমাজ এলো কোথা থেকে

অধ্যায় ৩- সভ্যতার বিকাশ - এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপে নগরায়ন ও রাষ্ট্র

প্রতিফলন: এবারে কিন্তু আমাদের অনুসন্ধানী কাজের প্রক্রিয়াটি ভাবব, যেমন প্রতি ধাপে কি কি কাজে অসুবিধা বা চ্যালেঞ্জ অনুভব করেছি, কেন? কীভাবে তা থেকে বের হলাম, কোন কাজগুলো করতে কেমন লেগেছে? ভবিষ্যতে আবার এই কাজটি করলে কি কি কাজ ভিন্ন ভাবে করবো, আর সর্বোপরি আমার নিজের অনুভূতি-কেমন ছিল কাজটি করে তা নিয়ে ভাবব।

একইভাবে অন্যান্য প্রশ্নগুলো নিয়েও আমরা **ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান (অনুসন্ধানী পাঠ)** বই ব্যবহার করে বিজ্ঞানের চোখ দিয়ে চারপাশ দেখি অংশে যে অনুসন্ধানের পদ্ধতি চর্চা করা হয়েছে তা অনুসরণ করে অনুসন্ধান করব।

এরপর প্রতিটি দল অনুসন্ধানে প্রাপ্ত ফলাফল বিভিন্ন উপায়ে উপস্থাপন করি। মিলির দল একটা সময় রেখা (টাইম লাইন) তৈরি করে কোন সময়ে কী কী ধরনের সমাজ ছিল তা দেখালো। আনাই এর দল অভিনয় করে বিভিন্ন সময়ের আইন আর তাদের পার্থক্যও দেখলো। অন্যান্য দলগুলোও পোস্টার এ উপস্থাপন করে, সে সময়কার বিভিন্ন নিদর্শনের মতো হুবহু একই রকম জিনিস তৈরি করে (Replica) প্রদর্শন করে। সেই সাথে গান গেয়ে, কমিক্স বই, ভিডিও বানিয়ে, নানা সৃজনশীল উপায়ে তাদের ফলাফল উপস্থাপন করলো।